সংবাদ

007

তারিখ ... ৭।৭।৮৩ ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৮ ...

গ্রন্থাগার

গ্রন্থাগার বনাম

উপ-জেলাসমূহে গ্রন্থাগার গড়ে তোলার আবেদন জানিয়ে একটি চিঠি দিয়েছেন একজন গ্রন্থাগারিক। তিনি চিঠিতে গ্রন্থাগারের উপযোগিতার উপর একটি সংক্ষিপ্ত বক্তব্যও পেশ করেছেন।

পত্র লেখক নিজে গ্রন্থাগারিক, বাংলাদেশ টেলিভিশনের গ্রন্থাগারে আছেন। তিনি রাজধানী ঢাকাতেই থাকেন এবং তথ্য প্রচারের অন্যতম শক্তিশালী মাধ্যম টেলিভিশনের সাথে যুক্ত। তার কথার সারবত্তা সম্পর্কে যেমন সংশয় নেই, তার বক্তব্যও বিতর্কিত নয়।

কিন্তু চিঠিটা ছাপতে যেয়েও ছাপিনি। এমন একটি চিঠি যার বিষয়বস্তু নিঃসন্দেহে আমাদের দেশে একটি বিরল দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় বহন করছে তা কেন ছাপিনি, অনেকে বলতে পারেন।

এর একটা কৈফিয়ত দিতে পারি। অনেকের ভাল লাগবে না। পত্র লেখকও মনে করতে পারেন, পত্রিকা অফিসে যারা কাজ করেন--খবর, সম্পাদকীয় ইত্যাদি বিভাগে তারা ছোটখাট একজন একনায়কত্ববাদী মানসিকতার অধিকারী ব্যক্তি।

অনেকে চিঠি দিয়েছেন। তাদের চিঠি ছাপা হয়নি বরং নির্দেশ গিয়েছে কর্তৃপক্ষকে লিখুন কিংবা এ ধরনের চিঠি দিয়ে কোন লাভ হবে না। যারা চিঠি দেন, তাদের সকলের মানসিকতা এক না হলেও আমাদের দেশে মতামত ব্যক্ত করার সুযোগ-সুবিধা যেখানে সীমিত, সেখানে পত্রিকার চিঠি-পত্র কলামে তাদের চিন্তার একটা ধারা, প্রবণতা প্রকাশের চেষ্টা করেন। কতগুলো চিঠি আছে স্থানীয় সমস্যা, কর্তৃপক্ষের ঔদাসীন্য কিংবা প্রভাবশালী ব্যক্তিদের জন্য কিভাবে সুবিচার লাঞ্ছিত হচ্ছে ইত্যাদি নিয়ে।

আবার নিজের মনোভাব সমাজ ও মানুষ সম্পর্কে চিন্তাধারার বহিঃপ্রকাশ ঘটে কোন কোন চিঠিতে। ''উপজেলাসমূহে গ্রন্থাগার চাই'' শিরোনামে চিঠিটি তার মধ্যে অন্যতম।

এ চিঠি নিয়ে লিখতে এজন্য মনস্থ করেছি যে, আমরা আপন আদর্শের জগতে বন্দী থেকে ভাবি ভাল এবং সৎ কিছু প্রস্তাব গ্রহণে তো কোথাও বাধা থাকার কথা নয়। এতে রাজনীতি নেই, সরকারকে সমর্থন জানানো কিংবা বিরোধিতা নয়, শুধু মানুষের চিৎপ্রকর্ষ ঘটানোর ক্ষেত্রে শিক্ষার যে ভূমিকা, সেখানে গ্রন্থাগার অপরিহার্য। তাছাড়া দেশের তথ্য ও বিবরণ, বিভিন্ন এলাকার অবস্থা সম্পর্কে জানাশোনার মাধ্যম প্রশাসনকে উপকৃত হতে সাহায্য করতে পারে।

উপজেলাসমূহে গ্রন্থাগার থাকলে লোকে উপকৃত হবে। কথাটা শুনতে ভাল লাগে। কিন্তু আগেই বলেছি--চিঠি না ছাপার যে কৈফিয়ত দিতে গিয়ে নিজেই লিখতে বসেছি, তার চিঠিটিকে মর্যাদা না দিয়ে তার জবাব চাইলে বিপদে পড়বো। সংস্কৃতে একটা কথা আছে: মা ব্রুয়াৎ সত্যম্ অপ্রিয়ম, অর্থাৎ অপ্রিয় সত্য কথা বলবে না।

বাংলাদেশে বহু প্রাচীন গ্রন্থাগার না হলেও স্থাবর সম্পত্তির মতোই তাদের নিজস্ব গ্রন্থাগার রেখে গেছেন। সেখানে দুষ্প্রাপ্য বই আর পাণ্ডুলিপি ছিল। প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান ও তার সরকারের সংগ্রহ এড়াবার জন্য হোক কিংবা রক্ষণশীল মানসিকতা, রাজনৈতিক কারণ যাই হোক না কেন, তাদের হাতে পাঠাগার তুলে দিয়ে যাবার কথা তারা ভাবেননি। সরকারও পরিত্যক্ত সম্পত্তি নিয়ে যেটুকু মাথা ঘামিয়েছেন সেখানে নীতিটা ছিল অস্পষ্ট কিংবা কোন নীতিই ছিল না, শুধু তাৎক্ষণিক প্রয়োজন মিটানো ছাড়া। কিন্তু গ্রামের যেসব লোক সহজে সম্পত্তি পাওয়ার সুযোগ পেয়েছে, কোনরূপ আদর্শ কিংবা নতুন রাষ্ট্রের সমাজ ও মানুষ নিয়ে ভাবিটাকে নিজের সংকীর্ণ স্বার্থের গণ্ডীতে দেখেছেন। বই নষ্ট হল কিনা হল তা নিয়ে ভাবেননি। খালি বাড়ী দখলের প্রতিযোগিতা হয়েছে সুস্পষ্ট সরকারী নীতির অভাবে। আর সরকারী নীতি বলতে যা বুঝি তা অনুসারীদের সন্তুষ্ট রাখার প্রচেষ্টাও দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। সুতরাং বই পোকায় কেটেছে, দোকানে গিয়েছে সেরদরে যদিও পয়সা তখন মিলত খুবই কম। জ্ঞানের বৃদ্ধির কথাটা যেখানে আমাদের শিক্ষানীতিতে কখনও ছিল না, সেখানে গ্রন্থাগার থাকবে এমনি কোন কারণ দেখি না। এ গেল পরিত্যক্ত মুষ্টিমেয় জমিদারদের ব্যক্তিগত লাইব্রেরীর ভবিষ্যৎ। আর দেশে এখন যেসব প্রাচীন লাইব্রেরী আছে, কোনদিন তার প্রতি নজর দিয়েছে কেউ তা পাকিস্তান আমলে হোক কিংবা স্বাধীন বাংলাদেশে হোক এমন অপবাদ দেয়া চলে না। ঢাকার পাবলিক লাইব্রেরীটি আমাদের মর্যাদার প্রতীক হতে পারে, জ্ঞানের প্রতীক নয়, যারা পড়াশুনা করেন ওখানে গিয়ে, তারা ছাত্র, অধ্যাপক। ওটা পেশাগত দায়িত্ব পালনের পর্যায়ে পড়ে অনেক ক্ষেত্রে। ছাত্ররা পড়েন পরীক্ষায় পাস করার জন্য। অধ্যাপকরা পড়েন ডক্টরেট করার জন্য। আর জনসাধারণ তার ছায়া মাড়ায় একথা কেউ হলপ করে বলতে পারবেন না।

১৯৮১ সালে আমি রাজশাহীতে গিয়েছিলাম দিন চারেকের জন্য পরিচিত স্বল্প পরিচিত বন্ধুস্থানীয় লোকদের অনুরোধে, ল্যাথিরিজম সম্পর্কে এক সেমিনারে। রাজশাহীর প্রসিদ্ধ লাইব্রেরীটি একদা দেশবন্ধু, গান্ধীজীর মন্তব্য বক্ষে ধারণ করে এখন ঐতিহ্যবাহী অচেতন হয়ে পড়ে আছে। গ্রন্থাগারের কর্মচারীদের অনুরোধে গেলাম সেখানে। তারা ৬ মাস বেতন পান না, বেতন সামান্য, একজনের পেট চলে কিনা সন্দেহ। কিন্তু সরকারী কর্মকর্তার সাথে মনোমালিন্যের জন্য বেতন বন্ধ হয়ে গেছে। তারা অফিস করেন পেটের দায়ে কপি যায়। এটা সরকারী নির্দেশ, কিন্তু বই রাখার ব্যবস্থা নেই। রাজশাহীর ঘটনাটা তুচ্ছ। সেখানে পদস্থ একজন ঢাকা থেকে গিয়েছিলেন। তিনি গ্রন্থাগারও পরিদর্শন করবেন এটা ঠিক ছিল, তিনি গিয়েছিলেন ঠিকই। তবে অফিস ছুটির পর, দু'ঘণ্টা আড়াই ঘণ্টা পার হয়ে গিয়েছে তখন। কর্মচারীরা অপেক্ষা করে চলে যান। এই নিয়েই তখন রাজশাহীর গ্রন্থাগারটির কর্মচারীদের ভোগান্তি বাড়ে।

মাসকয়েক আগে যশোর গিয়েছিলাম। তারপর মধুকবির জন্মস্থান সাগরদাড়িতে যাই। সেখানে তার স্মৃতিতে পাঠাগার আছে একটি। তার অবস্থা ভাল বলা চলে না, কারণ অর্থাভাবে বই কেনার ক্ষমতা সীমিত। খোঁজ নিলে দেখা যাবে দেশে প্রাচীন গ্রন্থাগার যে কয়েকটি রয়েছে, তার দুটো সমস্যা প্রধান। এক, বই রাখার স্থানাভাব কিংবা জরাজীর্ণভবনে গ্রন্থাগারটি রয়েছে। দ্বিতীয়তঃ, বই কেনার সঙ্গতি কম।

এসব সমস্যা সত্ত্বেও এসব গ্রন্থাগারে মূল্যবান বইগুলোর পাতা ক'জনে খোলেন সেটাই আসল কথা। জ্ঞান অর্জনে আনন্দ আছে, একথা বলেছিলেন ভাষাকল্পদ্রুম ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ।

১৯৬২ সালের শেষের দিকে একবার তার বেগম বাজারের বাসায় গিয়েছিলাম তার ছোট ছেলে তকীয়ুল্লাহর কাছে। তার নাতনী ভাবলো দাদুর সাথে দেখা করতে চাই। ফলে আমাকে ঢুকতে হল জ্ঞানতাপসের কক্ষে। যখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন কী চাই। অপ্রস্তুতভাবে বললাম আপনার কাছে আসিনি, এসেছি তকীয়ুল্লাহ'র কাছে। তিনি বললেন, 'বসো বসো কথা আছে। তকীয়ুল্লাহকে খবর পাঠাচ্ছি।' তারপর কথা প্রসঙ্গে তকীয়ুল্লাহর বন্ধু? তার মানে কমিউনিষ্ট। লেবার আনরেষ্ট ক্রিয়েট করতে চাও এই তো। আমি বললাম না, তকীয়ুল্লাহর বন্ধু ঠিকই তবে কমিউনিষ্ট নই। কিংবা কোন ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সাথে জড়িতও নই। তার চোখেমুখে কৌতুক। তবে এসেছো কেন? বললাম, কয়েকটা বইয়ের ব্যাপারে।

এবার তিনি একটু গম্ভীর হলেন। বললেন, ওইসব লেবার হাঙ্গামা ইত্যাদিতে না গিয়ে লোককে বই পড়তে শিক্ষা দাও। বই পড়ায় আনন্দ আছে। শুধু পেশার স্বার্থে বই পড়া নয়। জ্ঞান অর্জনে আনন্দ আছে এই উপলব্ধি থেকে বই পড়তে না শিখলে মানুষ হওয়া যায় না।

উপ-জেলা বলেই নয়। সব ছোট ছোট শহরে একটি ভাল পাঠাগার থাকা উচিত। কিন্তু বই পড়বে কে? গিন্নী-গয়নার পলিটিক্স চলে সরকারী কর্মচারী মহলে। সরকারের

বই-পড়া

অনিরুদ্ধ

গলদ এখানেই।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, অন্যে যা শিখায় তাতে শিক্ষা হয় না। নিজে যা শিখে তাতে শিক্ষা হয়। এই শিক্ষা মনুষ্যত্বের শিক্ষা। আর সেখানে বই আমাদের পথপ্রদর্শক হতে পারে, পরীক্ষায় পাসের তাড়া নেই। গাড়ী ঘোড়ার জন্য যে লেখা-পড়া নয়, সেই শিক্ষার তাগিদ চাই। নিজের অন্তর থেকে। বই কেনার সঙ্গতি সবার নেই। সেখানে গ্রন্থাগারই আমাদের সাহায্য করতে পারে।

দেশগড়ার কথা যদি উঠে, তবে দেশের সমস্যা চিনতে হয়, মানুষকে চিনতে যে পরিবেশ ও সংস্কৃতির সাথে সে জড়িত তাকে পর্যবেক্ষণ করার মত শক্তি চাই। এজন্য তথ্যের প্রয়োজন আছে। সুতরাং গ্রন্থাগার শুধু বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চা নয়, তার প্রয়োগের প্রশ্নও আছে। তা যদি না হয় তবে তো বই পড়ে সাঁতার শেখার পরিণতি হতে পারে। নদীতে নামতে হবে। ঘরে বসে কেউ সাঁতার শেখে না। কিন্তু এ জন্য ঐতিহ্যকে চলমান স্রোতের সাথে মিলিয়ে দেয়ার দৃষ্টিভঙ্গী থাকা চাই। প্রয়োজনের জন্য যেমন, চিত্তের বিকাশের জন্যও বই-এর প্রয়োজন রয়েছে। সেজন্যেই গ্রন্থাগার চাই। কিন্তু চাই বলে কার কাছে দাঁড়াবো?

আমাদের দেশে কোন বইই তা উপন্যাস, গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ কিংবা জ্ঞানের কোন শাখার বই-ই এক হাজারের বেশি বড় একটা ছাপা হয় না। এটা প্রমাণ করে আমাদের বই পড়ার অভ্যাস কম।

ড্রইং রুমে অনেকের বই আছে তা দেখার জন্য, পড়ার জন্য নয়। রবীন্দ্রনাথের 'বৈকুণ্ঠের খাতা' প্রহসনের সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোকের মত আমরা অনেকে। তার ঘরে বই দেখে একজনে প্রশ্ন করেছিলেন, আপনি এত বই পড়েন? জবাবে সে জানায়, আমি বই পড়ি না, বই বাজাই। তার একটা বই হাতে নিয়ে বাজাবার ভঙ্গীতে গান ধরল: "আমি ভাবিতে পারি না পরের ভাবনা।" আমরা কেউ পরের কথা ভাবি না। শুধু নিজের কথাই ভাবি। সেখানে বই-এর স্থান কোথায় দেবো?

রবীন্দ্রনাথের ভাষায়: [illegible] স্নেহগনির [illegible] পঞ্চ হাজার গ্রন্থ সোনার জলে দাগ পড়ে না খোলে না কেউ পাতা।"

এই মানসিকতার মুখে গ্রন্থাগারের কামনা ভঙ্গী দিয়ে চোখ ভোলানোর মতই।

সরকার উপ-জেলার সরকারী ভবনে অর্থাৎ অফিসে বই রাখার ব্যবস্থা রাখবেন শোনা গেছে।

পত্রলেখক আখতারুজ্জামান গ্রন্থাগারের প্রয়োজন সম্পর্কে যা

সমৃদ্ধির লক্ষ্যে বহুমুখী জ্ঞান আহরণের জন্য গ্রন্থাগারের উপর নির্ভরশীল না হয়ে পারছে না। কারণ গ্রন্থাগারের পুরোনো ইতিহাস আজ সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। গ্রন্থাগারে এখন শুধু আর গ্রন্থই থাকে না, জ্ঞানের সমস্ত শাখার সব ধরনের সামগ্রী সংগৃহীত হয়ে থাকে। তাই আধুনিক গ্রন্থাগারকে আজ তথ্যকেন্দ্র বলা হয়। সুতরাং আমাদের দেশকে উন্নয়নের পথে ধাবিত করতে চাইলে সরকারী প্রশাসনের সাথে জড়িত সকল বিভাগের কর্মিগণকে এবং একই সাথে জনগণকে ব্যাপকভাবে দ্রুত এবং চলতি তথ্য প্রদান করতে হবে। বই-পুস্তক, পত্র-পত্রিকা এবং অডিওভিস্যুয়াল সামগ্রীর দ্বারা একমাত্র গ্রন্থাগারের মাধ্যমেই সুষ্ঠুভাবে, আধুনিক পদ্ধতিতে সরকারী কর্মকাণ্ড, দেশ-বিদেশের বিভিন্ন তথ্য দ্বারা দেশের উন্নয়নে সর্বস্তরের জনগণকে সচেতন করার জন্য বাস্তব জ্ঞানে সুশিক্ষিত করে গড়ে তোলা সম্ভব। গ্রন্থাগার বা তথ্যকেন্দ্র বর্তমান উপ-জেলাসমূহে কোর্টের বিচারক, আইনজীবীদের আইন সম্পর্কিত চলতি তথ্য দান, অফিসসমূহের নথিপত্র থেকে ডকুমেণ্ট সংগ্রহ, কৃষি, জন্মনিয়ন্ত্রণ, সাহিত্য-সংস্কৃতি ইত্যাদি কর্মকাণ্ডে প্রয়োজনীয় সব ধরনের তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ করে দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সম্ভব।"

উপসংহারে তিনি এজন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে দৃষ্টি দিতে বলেছেন।

সেখানে অপ্রিয় সত্য এই যে, বই পড়ার অভ্যাস আমাদের গড়ে তোলার ব্যবস্থাটা ছাড়া এসব গ্রন্থাগার স্থাপিত হলেও তো লাভ হবে না।

বই পড়ার অভ্যাস যে আমাদের জাতীয় চরিত্রের অঙ্গীভূত নয় একটা তথ্যই তার প্রমাণ, তাহল আমাদের দেশে ছাত্রদের যারা শিক্ষা দেন আধুনিক কিণ্ডারগার্টেন করে, তার শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে জরিপে দেখা গেছে, অনেকেই বই পড়েননা। কারণ, সময় হয় না। সুতরাং যে শিক্ষা দানের পেছনে স্বাধীনভাবে চিন্তা করার শক্তি নেই শিক্ষা সেখানে পণ্যে পরিণত। দেশ ও মানুষের কথা যেটুকু বলা হয়, তা ছাত্রদের মনে ঔৎসুক্য সৃষ্টি করে না। অথচ এসব তারা মুখস্থ করে পরীক্ষায় পাসের জন্য। তার পরিণতি কী হতে পারে?

[illegible] চতুর্থ শ্রেণীর ইংরেজী বইয়ে [illegible] ঢাকা [illegible] সড়কে [illegible] বাসে যাওয়ার বর্ণনা আছে। বাসের ভিড়ের কথা আছে। কিন্তু সুকুমারমতি বালকরা যাদের চোখের উপর ঢাকা শহরের বাসে ভিড় রয়েছে, তারা এটা পড়লেও মনে প্রতিক্রিয়া হয় না। শিক্ষাদানের রীতি এমনই। সেখানে অজ পাড়াগাঁয়ে এই বই যারা পড়ে, তাদের মনে দাগ কাটে কী এই শহর জীবনের এই দৃশ্য? এর কারণ নীচু ক্লাস থেকে ইংরেজী ভাষার দৌড়। পরীক্ষার জন্য প্রাণ-